ইতিহাসের খোঁজে এক প্রাচীন ও ঐতিহাসিক রাজবাড়ির দুর্গাপূজা এবং মেলা দর্শন

তিলক পুরকায়স্থ

ঐতিহাসিক অম্বিকানগর — বিস্মৃত এক স্থান যেটি হাজার বছর আগে ছিল দিগম্বর জৈন রাজাদের দ্বিতীয় রাজধানী। এর পরে ৪০০ বছর আগে ঢোলপুর, রাজপুতানা থেকে আগত, ধবলদেব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় বাঁকুড়ার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ইতিহাস ও লৌকিক অনুষ্ঠান – এখানে মিলে মিশে একাকার। সঙ্গে অতিরিক্ত পাওনা – ব্রিটিশ যুগের এক সন্ন্যাসী রাজার ঐতিহাসিক উপাখ্যান। অনুরোধ করি, ঘুরে আসুন রাঢ় বাংলায়, বাঁকুড়ার রানীবাঁধের কাছে এই প্রত্যন্ত প্রান্তে। দেখুন কয়েক শতকের প্রাচীন এক ভগ্ন শেওলা ধরা দেওয়ালের ঐতিহাসিক রাজবাড়ি, যেখানে এখনও রাজাবিহীন রাজবাড়ির পুজোয় হামলে পড়ে একদা রাজ অনুগত প্রজাদের উত্তাল জনস্রোত।

২০১৭-র পুজোয় দশমীর সন্ধ্যায় গেছিলাম বাঁকুড়া জেলার অম্বিকানগরের রাজবাড়ির এক আশ্চর্য পুজো দেখতে। মুটুকমণিপুর থেকে গাড়িতে সর্বাধিক আধা ঘন্টার মতন পথ। নামেই এটি রাজবাড়ির পুজো, কিন্তু সর্বার্থে এটি প্রজাদের পুজো। এই রাজবাড়ির নামই হয়তো খুব কম লোকেই জানে, অথচ এগারোশো শতকে অম্বিকানগর ছিল দিগম্বর জৈন রাজাদের দ্বিতীয় রাজধানী। তখন বাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাজা অনন্ত বর্মণ। পরে দক্ষিণবঙ্গে জৈন ধর্মের আরও বিস্তারের যুগে এখানে রাজা ছিলেন রুদ্র শিখর,যিনি ছিলেন পাল রাজা রামপালের মিত্র। সেই সময় দেবী অম্বিকা ছিলেন জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথের শাসন দেবী। প্রচুর মন্দির, দেউল ইত্যাদি তৈরি হয় ভগবান পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের স্মরণে।

রানীবাঁধ থেকে কাঁসাই ও কুমারী নদীর সঙ্গমের নিকটবর্তী অম্বিকানগর বেশ নিকটেই। বিনয় ঘোষের লেখায় জানলাম যে — অম্বিকানগর, চিৎগিরি, বড়কোলা, পরেশনাথ, চিয়াদা, কেন্দুয়া ইত্যাদি গ্রামে আনুমানিক ৮/৯০০ বছর আগে একটি বিরাট জৈন উপনিবেশ ছিল এবং এঁদের হাত ধরে জৈন সংস্কৃতির চর্চাও বিস্তার লাভ করেছিল। অতিশয় দুঃখের কথা যে উন্নয়নের স্বার্থে এই বিশাল সংস্কৃতি কেন্দ্রের আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। কংসাবতী বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রাচীন

উপনিবেশের প্রায় পুরোটাই এখন বাঁধের জলে ডুবে গেছে। কোনও রকম রি-এলোকেশন করার চেষ্টা না করে এরকম একটা সভ্যতার চিহ্নকে ধ্বংস করে দেওয়া বোধহয় এদেশেই সম্ভব।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দেবলা মিত্র তখনই আশঙ্কা করেছিলেন যে এই বিশাল সভ্যতার চিহ্ন লোপ পেতে চলেছে। তিনি ১৯৫৮ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে পার্শ্বনাথ, নেমিনাথ, ঋষভনাথ ইত্যাদি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি গুলি এবং প্রস্তর নির্মিত রেখদেউলগুলির বর্ণনা দিয়েছিলেন। এখন এই লেখাটিই কেবল ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া উপনিবেশের একমাত্র ডকুমেন্ট।

একই কথার উল্লেখ আছে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' বইয়ে। ওনার লেখাটি উদ্ধৃতির মধ্যে দিলাম — "১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে (খণ্ড ২৪; সংখ্যা ২) প্রকাশিত শ্রীমতী দেবলা মিত্রের 'সাম জৈন আন্টিটিকুইটিস ফ্রম বাঁকুড়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল' – শীর্ষক প্রবন্ধে অম্বিকানগরের কাছাকাছি পরেশনাথ, চিৎগিরি, বড়কোলা, চিয়াদা ও কেন্দুয়াতে প্রাপ্ত বহু জৈন নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে।"

এখন কথা হচ্ছে এই দেবী অম্বিকা কে? অম্বিকানগরে তিনি পূজিতা হচ্ছেন দেবী চণ্ডী বা দুর্গা বলে, আবার আরেক বিখ্যাত জায়গা অম্বিকা কালনায় তিনি হচ্ছেন দেবী সিদ্ধেশ্বরী চতুর্ভূজা কালি। আপনারা হয়তো বলবেন নামে কি বা এসে যায়? ইতিহাসের মানচণ্ডে কিন্তু অনেক কিছু এসে যায়। আসুন সেই ইতিহাস খুঁজতে দেবী অম্বিকার আদি রূপের উপর একটু আলোকপাত করা যাক। জৈন দেবী অম্বিকার উপাসনা, সম্ভাব্যরূপে খ্রিস্টিয় ১০/১১ শতক থেকে খ্রিস্টিয় ১৩/১৪ শতক অবধি, জৈনদের দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে আলাদা আলাদা গাত্রবর্ণের হতেন এই দেবী যেমন – সাদা, টকটকে লালা, হলুদ ইত্যাদি। কখনও তিনি দ্বিভূজা, কখনও চতুর্ভূজা, অষ্টভূজা এমনকি কুড়ি হাতের দেবী অম্বিকার কথাও জানা যায়। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি জৈন দেবদেবীও আস্তে আস্তে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীদের ন্যায় পূজাপাঠ পেতে লাগলেন। দেবীর বিভিন্ন হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুক, আম্রপল্লব, সাপ ইত্যাদি শোভিত পেতে লাগল। অম্বিকাদেবী সিংহবাহিনী তাই ক্রমে ক্রমে ধর্মীয় আত্মীকরণের হাত ঘরে উদারমনা হিন্দু বাঙালি সমাজে দেবী অম্বিকা অতি সহজেই মা চণ্ডী ও মা কালির মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে মা চণ্ডীর রূপে অম্বিকানগরে এবং মা সিদ্ধেশ্বরী কালি রূপে অম্বিকা কালনায় পূজিতা হতে লাগলেন।

জৈন ধর্মের প্রধান বই 'আচারাঙ্গ সূত্ত' অনুসারে তীর্থঙ্কর মহাবীর যেসব জায়গায় পরিভ্রমণ করেছিলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে লাঢ় ভূমি। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে— লাঢ় ভূমি হচ্ছে বর্তমানের রাঢ় ভূমি।

এর অনেক বছর পরে রাজপুতানার, ঢোলপুর থেকে আসা জনৈক খঙ্গেশ্বর ধবলদেব মহাশয় ৪০০ বছর আগে পত্তন করেন তার রাজত্ব কংসাবতী নদীর তীরে জঙ্গলঘেরা অম্বিকানগরে। ইতিমধ্যেই জৈন দেবী অম্বিকা হয়ে গেছেন হিন্দু দেবী দুর্গা। আবার আরেক মতে, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেলে, বড় পক্ষ জমিদার হয়ে বসেন খাতরা গ্রামে। ছোট পক্ষ ঝোপ জঙ্গল কেটে কংসাবতী ও কুমারী নদীর মধ্যে স্থাপনা করেন তাঁদের নতুন বাসস্থান এবং দেবমন্দির। অম্বিকানগরের অবস্থান কাঁসাই নদীর দক্ষিণে, বাস বা গাড়িতে আসার পথ – আসানসোল / দুর্গাপুর - বাঁকুড়া - রানীবাঁধ - অম্বিকানগর, পুরো পথটাই বেশ ভালো, পিচ রাস্তা। পৌঁছুতে কোনোই অসুবিধা হবার নয়। তবে তিন বছর আগেও কিন্তু রাস্তার হাল খারাপ ছিল। এখন সেই তুলনায় যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

একটি প্রচলিত মত হচ্ছে, ধবলদেব রাজাদের কুলদেব ছিলেন – কালাচাঁদ এবং কুলদেবী – অম্বিকা। এই কুলদেবীর নামেই নাকি অম্বিকানগর। রাজারাই নাকি প্রচলন করেন বর্তমানের দুর্গাপূজার। এই রাজপরিবারেই জন্ম বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত বিপ্লবী কুমার রাইচরণ ধবলদেবের। কে তাঁকে মাথার দিব্বি দিয়েছিলেন জানি না, রাজপরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দিয়ে এই প্রত্যন্ত প্রান্তের জঙ্গলমহলে বিপ্লবীদের গুপ্ত আস্তানা গড়ে তুলবার জন্য! তবে যার আহ্বানে উনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁকে আমরা সবাই চিনি, জানি — তিনি আমাদের দেশ মাতৃকা বা ভারতমাতা। তাঁর আহ্বান যিনি শুনেছেন, তাঁকে তো কেউ রোধ করতে পারবে না। বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় রাইচরণ বাবুকে গ্রেপ্তার করতে কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট সাহেব স্বয়ং রাজবাড়িতে এসেছিলেন। শেষ অবধি প্রমাণের অভাবে এই সন্ন্যাসী রাজাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

অম্বিকানগর গ্রাম কিন্তু বিখ্যাত আরও অনেক কারণেই। **এক** — এখানে প্রাগৈতিহাসিক মানব জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। **দুই** — অম্বিকানগরের পশ্চিমে এবং অতি সামান্য দূরে পরেশনাথ নামক স্থানে একদা এক অতি সমৃদ্ধ জৈন বসতি ছিল। সেখান প্রায় ৬ফুট উচ্চতা সম্পন্ন জৈন দেবী অম্বিকা বর্তমানে হিন্দু দেবীতে রূপান্তরিত হয়ে পূজিতা হচ্ছেন এখানের

মন্দিরে। প্রাচীন ভগ্ন বেদির ওপরে বর্তমানের মন্দিরটি নির্মাণ করেন রাইচরণ বাবুই। এই মন্দিরের পাশে মাকরা পাথরে দেউল মন্দিরেই আছেন দেবীর ভৈরব রূপে শিবঠাকুর। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে শিবমন্দিরটির মাপ দিয়েছেন নিম্নরূপ – দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় প্রায় ১৫ ফুট। এই স্থানেই আরও আছেন জৈন মুনি ঋষভ নাথ এবং কালুরায় বা কালুবীরের পাথর খোদাই মূর্তি। কালুবীর আবার ছিলেন ধর্মরাজ ঠাকুরের ভক্ত এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত লাউসেনের সেনাপতি। মা ভবানীর ভক্ত মহামাণ্ডলিক ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে কালুবীর নিহত হন।

আজ সবই কালের গর্ভে খণ্ডহর। কংসাবতী ড্যামে ট্যুরিস্টরা নৌ-বিহার করেন। জানতেও পারেন না যে ড্যামের জলের নীচেই ইতিহাস গুমরে গুমরে কাঁদছে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়ির ঠাকুরদালান, রাসমঞ্চ ইত্যাদি এখন স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সাবেক প্রজারা এবং আপামর গ্রামবাসী সাফ সুতরো করে দুর্গাপূজা করে। নামটা যদিও রয়ে গেছে রাজবাড়ির পুজো। আমরা গিয়ে পৌঁছেছি দশমীর সন্ধ্যায়। লোকে লোকারণ্য, সবই আশপাশের গ্রামের দেহাতি লোকজন, সার বেঁধে চলেছে পুজো দেখতে। জমজমাটি মেলা, সার বেঁধে রকমারি দোকানপাট, তৈজসপত্র থেকে স্থানীয় কামার/কুমোরদের হাতের কাজের সামগ্রী বিক্রির জন্য রাখা আছে, আবার আধুনিক ইলেকট্রনিক এর দোকানিরাও আছেন। তবে কাটতি সবচেয়ে বেশি খেলনা, চুরি, ইমিটেশনের গয়না, বেলুন, বাচ্চাদের বাজাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাঁশি এবং মিষ্টির দোকানের। আর মিষ্টির পদও কত রকমের। একেবারে গ্রামীন মিষ্টি যেমন মুড়কি, তিলের মিষ্টি, কদমা, দানাদার যেমন আছে তেমনি আছে জিলাপি, অমৃতি, নিখুঁতি, রসগোল্লা, পান্তুয়া, ঢাকাই পরোটা, এমনকি মোগলাই পরোটাও। থিক থিক করছে লোকজন, গ্রামীণ মানুষের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস এবং উল্লাসের প্রতিচ্ছবি তাঁদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

তৃষ্ণায় গলা ফেটে যাচ্ছে, গাড়ি রেখে প্রায় ৩ কিমি হেঁটে পৌঁছেছি। একজন মহিলা কিছু কাজ করছিলেন, তাঁর কাছেই খাবার জলের খোঁজ করলে, তিনি একটি ছেলেকে দেখিয়ে দিলেন। ছেলেটির নাম শুনলাম মদন। এ নিজে গিয়েই আমাদের জন্য খাবারের জল নিয়ে এলো ওর বাড়ি থেকে। মহিলাটি শুনলাম মদনের মা। মদনের মা কাঠের বারকোষে প্রসাদ মাখতে মাখতে চেঁচাচ্ছেন – ওরে মদনা, ঘর থেকে কলার কাঁদিটা নিয়ে আয় বাবা, তো আরেক মহিলা বললেন – ওমনি আমার

ঘর থেকে চিঁড়ের টিনটা নিয়ে আসবি। তো সেই কলা, চিঁড়ে দিয়ে আমজনতার সান্ধ্যপ্রসাদ হলো, যার একটু ভাগ আমরাও পেলাম।

১০/১২টি জোয়ান ছেলে, শাড়ি পরে মেয়েদের সাজে তুমুল নেচে চলেছে। স্থানীয় ভাষায় নাকি এর নাম 'তারে নারে নাচ'। শুনলাম যে আগে হাতে কাঠি নিয়ে এই নাচ হতো, তাই তখন একে 'কাঠি নাচ'ও বলা হতো। তবে কালের বিবর্তনে এখন ছেলেরা এক টুকরো রঙিন কাপড় হাতে নিয়ে নাচে। প্রচুর মেয়ে সেজেগুজে মণ্ডপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এ নাচ একেবারেই প্রমীলা বর্জিত। হয়তো এটি কোনও প্রাচীন ট্র্যাডিশন, যখন পুরুষেরাই মহিলা সেজে মনোরঞ্জন করতেন। খোল করতাল সহযোগে সেই নাচ দেখতে তুমুল হুটোপুটি। মা দুর্গা ও তাঁর পরিবারকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

তিন বছর আগে যখন গেছিলাম তখন অম্বিকানগরে পৌঁছানো বেশ কষ্টকর ছিল। এখন রাস্তাঘাট অনেক উন্নত। ঝোপঝাড়পূর্ণ ঠাকুরদালান, যেখানে আগের বার দিনের বেলাতেই ভয়ে ঢুকিনি, সেখানে এখন দুর্গাপূজা হচ্ছে। দুটি দেউল মন্দিরের মধ্যে একটিতে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি রাখা। মন্দিরকে সাদা রঙের সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়াতে বলাও মুশকিল দেউল দুটি ইঁটের না পাথরের নির্মিত। তবে ইঁটের বলেই মনে হয়। যদিও রেস্টোরেশনের নামে সিমেন্ট প্রলেপ দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত জানি না। তবে রাজবাড়ির ভাঙা দেওয়াল সেই একই আছে। আরেকটা কথা অম্বিকানগর এবং রাজবাড়ির এই ধ্বংসস্তূপগুলি যেমন রাসমঞ্চ, অম্বিকা দেবীর আদি মন্দির, ঠাকুরদালান, দেউল মন্দির ইত্যাদি কার তৈরি বা কাদের হাতে তৈরি – রাজা অনন্ত বর্মণ, নাকি রাজা রুদ্র শিখর, নাকি অনেক পরবর্তী রাজা খড়্গেশ্বর ধবলদেব মহারাজের! — এর উত্তর আমার জানা নেই কারণ অম্বিকানগরের ইতিহাস এক বিশাল ক্যানভাসে আঁকা –জৈন ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে ক্রমপরিবর্তনের এক চলমান ইতিহাসের অস্পষ্ট অধ্যায়।

তথ্যসূত্র :

(১) অগ্নিযুগের চিহ্ন আঁকড়ে অম্বিকানগর, দূর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। https://esamayindiatimes.com>home।

(২) বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩) বাঁকুড়া জেলার পুরাতত্ত্ব, লোকসাহিত্য ও দর্শনীয় স্থান, সুমন্ত মণ্ডল, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

(৪) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। বিনয় ঘোষ, ১মখণ্ড, প্রকাশভবন, কলিকাতা-৭০০০১২।